রচনার খসড়া

লীলা অপুকে বোনের মতো দেখে ... ভালোবাসে ..

যখন অপুর স্ত্রীমৃত্যু .. তখন ... অপর্ণার মায়েরওমৃত্যু—

লীলা বিবাহিতা ... বিদেশ ...

সুতরাংlonely ...

শেষে—বিদেশে lonely ... একা... বন ...

not even the son.

সামান্য মাহিনার চাকুরি। Slum life with অপর্ণা।

শ্বশুর দেখতে পারে না।

A new life after the death of W.

Ranu Di —a Widow —পবিত্র, spiritual life in somewhere else, then at home. ঘাটে দেখা, নিমন্ত্রণ ওরাণুদি ছেলেদের মানুষ করে। সতু ভাই-এর বাড়ি ঝাঁটালাথিতে মানুষ।

Lila —an unhappy girl... wedded to a drunkard husband. is beaten. a girl ... 2 boys, neglected ... driven out but called again ... goes, tries to reform him

প্রণব নিরুদ্দেশ। নির্মলার মৃত্যু—তার ভাই জানায়।

বন্ধুর ছেলে নিরাশ্রয়। গোকুল তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।ছেলেকে কলিকাতায় আনে। বধূ গলায় দড়ি ?

Lila – থাইসিস্ – রূপ নাই ... সারাজীবন বৃথা কষ্ট... মেয়ে

Tragedy ঠিক লীলা ... তোমার ছেলেকে দেখব ...একটা সাধ .. ওদের বিয়ে ...

ব্যর্থতা ... মৃত্যু ... মেয়ে আছে ... ওকে দেখতে পারে না... Jealous ... প্রীতি ও তার স্বামী ওকে ডাকে। ছাত্রীরস্নেহ। নিরুদি – নিরুদ্দেশ ..

বহুকাল পরে হাসপাতালে দেখা ?মৃত্যু ... মৃত্যু ...

না – লীলা ?

গুল্‌কী– শান্ত ঘরকন্না। ছেলেপুলে —

অমলা— ,, ,, ,,

বধূ—— ,, ,, ,,

পাণ্ডুলিপি :দৃষ্টিপ্রদীপ উপন্যাসের খসড়ার কয়েকটি পৃষ্ঠা

[একটি পৃষ্ঠা]

আমার শিক্ষার কি দোষ যে গোড়ায় হয়েচে, সব কথাআমার আদৌ ভালো লাগে না—ব্যস্ত হয়ে উঠি একথার আবহাওয়া থেকে পালাবার জন্যে; আমার মনে হয় আমারবননীল দিগন্তের রূপ অক্ষয় হোক, পাখির কূজন-ভরা স্তব্ধমধ্যাহ্ন অক্ষয় হোক্—ভগবান যে সৌন্দর্যময়, তাঁর সেইরূপই যে আমি ছেলেবেলায় চোখ দুটি মেলে হিমালয়েরওক্-পাইন-রডোড্রেনডন বনে দেখেচি, তুষারশুভ্রকাঞ্চনজঙ্ঘার তপস্যামৌন মূর্তিতে দেখেচি, নিভৃত চা-ঝোপের মধ্যে একা বসে আকাশের পটে-দেখা কত কিঅদ্ভুত অবাস্তব আশ্চর্য লোকের ছবিতে দেখেচি। সামীপ্য, সাযুজ্য আমি বুঝি নে—আমি ওকে ভাবলুম বলি ভগবানকি দূরে আছেন ?মাছ যেমন সমুদ্রের জলে ডুবে থাকে, আমরা যেমন বায়ুসমুদ্রে ডুবে আছি অথচ সব সময় সেবিষয়ে সচেতন নই—ভগবানেও আমরা তেমনি ডুবে আছিতিনি আমাদের চারিপাশে ঘিরে, তিনি আমাদের ওপরে, তিনি আমাদের নীচে, তিনি ডাইনে, তিনি বাঁয়ে—অথচ সেসম্বন্ধে আমরা সচেতন নই।

কতদিন নির্জন সন্ধ্যায় নদীর ধারে ওপারের প্রথম-ওঠা ক্ষীণ নক্ষত্রটির দিকে চেয়ে হাতজোড় করে আপনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকেচি—মুখে কোনো কথা বলিনি, কিন্তু অনুভব করেচি অসীম অনন্ত নক্ষত্রলোক থেকে অদৃশ্য অমৃতধারাযেন প্রাণেমনে ঝরে পড়চে কোন্ অজানা নামহীন দেবতার আশীর্বাদের মতো। কী অপূর্ব শক্তিতে ও আনন্দে ও নির্ভরতায় ও পবিত্রতায় সমস্ত দেহমন ভরে উঠেচে, সেই অজানা দেবতাকে উদ্দেশ করে বলেচি—হে বিশ্বরূপ, আমিআপনাকেই ভালোবাসি, আপনি আমার এ মন, এ চোখ জন্ম-জন্মান্তরেও এই রকমই রেখে দেবেন যেন আপনারবিশ্বকে ভালো চোখে দেখতে পারি, সুন্দরকে যেন চিনতেশিখি। এই আমার

[অন্য পৃষ্ঠা]

মালতী ভালোই হয়েচে তোমার সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। তোমার প্রতি আমার প্রেম আমার মনের নিভৃত দেবায়তনে—পবিত্র ও অক্ষয় হয়ে বিরাজকরুক—দ্বিভুজা রক্তবর্ণ গায়ত্রীর মতো। সুষুপ্তজ্যোৎস্নারাত্রে হেমন্ত সন্ধ্যায় পল্লীপ্রান্তের বনে মরচে লতায়ফুল ফোটে, সুবাসে রসিক পথচারীদের মন আনন্দে ভরিয়েরাখে—কিন্তু কতদিন তার আয়ু ?জ্যোৎস্না লুকিয়ে আঁধারপক্ষ আসে—বনফুল ঝরে যায়। সুধাসুরভি হিমের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে, নয়তো অকালবর্ষার বারিধারায় ধুয়েমুছে লুপ্ত হয়।

ভগবান বড় আর্টিস্ট। তিনি তার রূপকে চির নবীনরেখে দেবেন, মানুষের অনেক সেবা সে করেছিল, সেই মানুষের মনে তাকে ম্লান হতে দিলেন না। সময় তারমুখশ্রীর সুকুমার লাবণ্যকে এতটুকুনষ্ট করতে পারবে নাবলেই তাকে পৃথিবী থেকে সরিয়েচেন। আমার মনে তাঁরস্থানটি এমনই অক্ষয় থাকবে—যতদিন আমি বাঁচবো—কারণ সে এখন আমার চোখের আড়ালে। যদি আমি দুঃখপাই, সে দুঃখের মধ্যেও থাকবে সৌন্দর্য—সেখানেমালতীও সুখী, আমিও সুখীই। ভগবান তাকেভালোবাসতেন, তার প্রেমেরঅবমাননা হতে দেবেন না—শীতের রাত্রির কুয়াশার থেকে তাকে বাঁচিয়েছেন, রৌদ্রতাপথেকে আশ্রয় দিয়েচেন। ফুলের সুবাস মিলিয়ে গেলেওবনলতা অনাদৃতা, উপেক্ষিতা হবে তা তিনি সহ্য করবেন—মালতীর বেলায় নয়।

আবার সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বাজচে গোপীনাথ জিউরমন্দিরে সেই সব পুরোনো দিনের মতো। তমাল শাখারআড়ালে চাঁদ উঠেচে। মাদার গাছটার গুঁড়ির ওপারে যেন মালতী যেন ধীরে ধীরে দাঁড়িয়েচে। যেন তার ছেলেমানুষী ধরনে ঘাড় দুলিয়ে হেসে হেসে বলচে—চলে গিয়েছিল যেবড় ?আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই ?

আছে—মালতী। এতদিন পরে মনে পড়েচে।আটঘরার পুকুরের ধারে সেই হাতভাঙা বিষ্ণুমূর্তির কথাআমি ভুলিনি। হাতে পয়সা নেই এখন, চিরকাল এমনি যাবে না।তোমার বাবার বিষ্ণুমন্দির আমি ভাঙাচোরা অবস্থায়থাকতে দেব না, তোমার সাধ আমি বেঁচে থাকতে অপূর্ণথাকবে না।

[অপর পৃষ্ঠা]

এদের আখড়াতে মদনমোহন জিউ-এর বিগ্রহ আছেন; তাঁকে এরা মানুষের মতো সেবা করে। সকালবেলা উঠে তাকে বাল্যভোগ দেওয়া হয়, দুপুরে খাওয়ানো হয় ভোগরেঁধে। দুপুরে বিগ্রহটি খাটে শুইয়ে মশারি টাঙিয়ে দেওয়াহয়—আবার সন্ধ্যারতির পরে ভোগ দেওয়া হয় লুচি, হালুয়া, বেগুন ভাজা; রাত্রে আবার মশারি টাঙিয়ে শুইয়েদেওয়া হয়, শীতের রাত্রে লেপ গায়ে, আশেপাশে বালিশ। মালতী অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে নিজের হাতে বিগ্রহের পরিচর্যাকরে, রাত দশটার সময় নিজে গিয়ে ঢেকেঢুকে আসবেবিগ্রহকে।

এই সবপুতুলখেলা দেখলে আমার হাসি পায়—কিন্তু মালতী এসব অত্যন্ত বিশ্বাস করে, ওই সব নিয়েই সেআছে।

একদিন খুব বাদলার দিনে মালতীকে বলেছিলুম—মালতী, যে ঠাণ্ডা পড়েচে, তোমার ঠাকুরকে একটু আদা-চাকরে দাও গিয়ে। মালতী রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে চলে গেল।

এরা আখড়াসুদ্ধ সবাই ওতে বিশ্বাস করে, লোচনদাস বাবাজি সেদিন লাল শালু কাপড়ের ভালো লেপ করে এনেচে বিগ্রহ শীতকালে গায়ে দেবেন বলে—আগেরলেপটার তুলো বেরিয়ে নষ্ট হয়ে নাকি অব্যবহার্য হয়েগিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় একা পেয়ে মালতীকে বল্লুম—তোমাদের এতদিন হুঁশ ছিল না মালতী ? ছেঁড়া লেপটা এইশীতে কি বলে দিতে ঠাকুরকে ?যদি নিমোনিয়া হত ?এইতেপান্তরের মাঠে কি ডাক্তার আছে না কবিরাজ আছে ?কেদেখত তখন ?ছিঃ ছিঃ কি কাণ্ড তোমাদের ?

মালতী রাগ করে দুদিন আমার সঙ্গে কথা বলেনি। ওএসব কথা শুনে আর কাউকে বলে দেয় না ভাগ্যে, নইলেআমায় লোচনদাস আখড়া থেকে বিদেয় করে দিতে এক বেলাও দেরি করত না।

মালতীর ওপর দেখেচি, আমার এই নির্ভরতার ভাব বেড়ে উঠেচে—আগে যে মালতী দূরে থাকত, অনাসক্তভাবে অতিথি হিসেবে আমার ওপর যে কর্তব্য কর্ম সেটা করে যেত, আজকাল সেই মালতী আমার দিকে খুবটেনে বলে ব'লে আখড়ার অনেকের একটু চক্ষুশূলের কারণঘটেচে সেটা। আমি সেটা বুঝি। কত কথা মালতীকে বলি, লোচনদাস সম্বন্ধে, ঠাকুর সম্বন্ধে, তার নিজের সম্বন্ধে,—যা অপরের কানে উঠলে আমায় অপমানিত হয়ে আখড়াথেকে বিদেয় হতে হত—কিন্তু মালতী কাউকে সে সব কথা বলে দেয়নি কোনোদিন। [অন্য এক পৃষ্ঠা]

প্রতিদিনের সূর্য তার দ্রুতগতি রথচক্রে নীলাকাশ বিদীর্ণ করে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে গিয়ে শুক্রতারারআলোকোজ্জ্বল রাজপথে রাঙা ধূলি উড়িয়ে রজনীর অন্ধকারে অদৃশ্য হন—প্রতিদিনই সেই সন্ধ্যায় আমার মনে কেমন এক উন্মাদ আনন্দ আসে—দেখিযে পুকুরের ধারেবর্ষার ব্যাঙের ছাতা গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের অমৃতকিরণে বড় হয়ে পুষ্ট হয়ে উঠচে। দেখি বল্মীকস্তুপে যৌবনোমুখ উদ্‌গতপক্ষ উইয়ের দল অজানা বায়ুলোক ভেদকরে হয়েচে নিরুদ্দেশের যাত্রী—হয়তো বা মরণেরও—অপরূপ সৌন্দর্যে ভূষিত শরতের কাশবন, কার বিধানমতজীবনসৃষ্টির বীজরাশি দূরে দূরে দিকে, দিগন্তে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার মধ্যে পাচ্চে পরমকাম্য সার্থকতা—তাঁর কথাভাবতেই আমার মন বিপুল শক্তি ও কল্পনার মৃতসঞ্জীবনীসুধায় ভরে ওঠে—তুচ্ছ দারিদ্র্য, তুচ্ছ কষ্ট, তুচ্ছ পৃথিবীরসমস্ত বিলাসলালসা,—আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। আমিএই জাগ্রত চেতনাকে যদি না কখনোহারাই—যদি হেবিশ্বদেবতা, বাল্যে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘাকে যেমন প্রভাতসূর্যের সোনা রঙে রঞ্জিত হতে দেখতুম—তেমনি যদিআপনি আপনার ভালোবাসার রঙে আমার প্রাণ রাঙিয়েতোলেন, আমিও আপনাকে ভালোবাসি যদি—যদি সেঅসম্ভব ঘটনা সম্ভব হয়—তবে সকল দুঃখ অপমান ওসংকীর্ণতাকে জয় করে আমি আমার বিরাট চেতনার রথচক্রচালিয়ে দিই শতাব্দী থেকে শতাব্দীর পথে—জন্মকে অতিক্রম করে মৃত্যুকে অতিক্রম করে আবার কৌতূহল[কৌতূহল] ভরা পরজন্মের অজানা রহস্যের আশায়।

[অন্য আর এক পৃষ্ঠা]

বটেশ্বরনাথের পাহাড়ের দিনগুলো আমার মনে চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকবে। রূপে, বেদনায়, স্মৃতিতে, অনুভূতিতে কানায় কানায় ভরা কি সে সব অপূর্ব দিন !জীবনের মধ্যে গভীরতম আনন্দের সে সব দিন প্রেমেরঅমর মধুমুহূর্তগুলির ছায়াপাতে স্নিগ্ধ ও চিরশ্যামল। শরতের দুপুরে নিভৃত পিয়ালতলায়, নিভৃত বননিবিড় অধিত্যকায় চুপ করে শিলাখণ্ডে ঝরা পাহাড়ি কুড়চি ফুলেরশয্যায় বসে চারিদিকের রৌদ্রদীপ্ত পাহাড়শ্রেণির রূপ, শরতের নির্মল নীল আকাশের নানা সাদা মেঘস্তূপের দিকেচেয়ে চেয়ে মালতীরই ভাবনায় সারাদিন কাটিয়ে দিতাম।তিনটাঙায় দিবারাতে বটগাছের সবুজ মগডালে সাদা সাদা বকের সারি বসে আছে, যেন অজস্র সাদা ফুল ফুটে আছে, কত কী রং, প্রথমে মাটির ধূসর রং, তারপর কালো সবুজগাছপালা, তার ওপরের পর্দায় ঘন নীলকৃষ্ণ পাহাড়, তারওপরে সুনীল আকাশ ও বেলাশেষের পিঙ্গলবর্ণের মেঘস্তূপ, সকলের নীচে ফুলে ফুলে ভরা গৈরিক জলরাশি—কিসেযেন ছেলেবেলায় পড়েছিলাম, মনে পড়ে—

অলসে বহে তটিনী নীর—

বুঝি দূর—অতি দূরে সাগর—

তাই গতি মন্থর,

শ্রান্ত, শান্ত পদসঞ্চার ধীর—

আগে প্রেম কাকে বলে জানতাম না, জীবনে তা কী দিতে পারে তা ভাবিওনি কোনোদিন। এখন মনে হয় প্রেমটাই জীবনের সবটুকু। স্বর্গ কবির কল্পনা, স্বর্গ এইপিয়ালতলায়—স্বর্গ তার স্মৃতিতে। বিশ্বরূপ, আমি এ দয়ারউপযুক্ত নই, এত আনন্দও সইতে পারিনে। এত বেদনাও নয়, আমায় কি পাগল করে দেবেন শেষে ?কী রূপ এশিলাস্তৃত অধিত্যকার, কী রূপ ওই উচ্চ মেঘপদবীর, ওইপুণ্যসলিলা নদীর, ওই বননীল দিগন্তরেখার !

[পরপৃষ্ঠায়]

ওই দূর পাহাড়ের ওপারে দৃষ্টি গেলেই মনে হতমালতী, সে এখন কি করচে?আখড়ার দাওয়ায় বসে কাপড়সেলাই করচে .. মুগ কলাই ঝাড়চে, টান টান করে চুলটিবেঁধে ফুল্লাধরে মৃদু হেসে—কারণ সে হাসি ছাড়া থাকে না—বিষ্ণু মন্দিরে প্রদীপ দেখাতে যাবে আর একটু পরে।আজ মঙ্গলবার, সে উপোস করে আছে সারাদিন, সন্ধ্যার পরে ফল ও দুধ খাবে, সেই যে নিঃসঙ্কোচে একা আমারসঙ্গে সিদ্ধির জঙ্গলে-কুড়িয়ে-পাওয়া শিবের মন্দিরেবেড়াতে গিয়েছিল, পুকুরের ঘাটে বসে বসে আমাকে গানশোনাত। কিন্তু আর কারুর সামনে কখনো সে গায়নি, যেরাশভারি মেয়ে এদিকে আবার, যতই হাসিখুসি তার মুখেলেগে থাকুক। গান গাইতে তাকে অনুরোধ করতে আখড়ারকারুর সাহস হত না কোনোদিন—সেই একদিন বই লিখছিল বসে, আমি যাওয়াতে খাতাটা ঢেকে ফেল্লে—সকলের ওপর তার সেই হাসি, তার মুখের সে অপূর্ব হাসি !.. কত কথাই মনে এসে নির্জনে যাপিত প্রতি প্রহরটি আনন্দ বেদনায় অলস করে দেয়।

দূরের গিরিসানুর গায়ে ক্রীড়ারত ধূমল মেঘরাজির মধ্যে এমন কি কোনো দয়ালু মেঘ নেই যে এই কূটজ কুসুমাস্তীর্ণ নিভৃত অধিত্যকার ওপর দিয়ে যেতে যেতে পিয়ালতলায় এই নির্বাসিত যক্ষের বিরহবার্তা বাংলাদেশের সেই প্রান্তরমধ্যবর্তী অলকাপুরীতে পৌঁছে দেয় তার কানে ?

দুপুরে যেন তন্দ্রাঘোরে দেখি মালতী এসে কাঁদ কাঁদমুখে সাম্‌নে দাঁড়িয়েচে, তার সেই বিশাল চোখ জলে ভরে গিয়েচে... বল্‌চে... কেন চলে এলে আমায় না বলে ?চলেআসতে পারলে তো ?আখড়ায় কত কাজ বাকি আছে মনেনেই ?

না—মালতী আর ফিরব না। পাছে তুমি কাছে পেয়েঅনাদর কর ! তা সইতে পারব না, মালতী। তার চেয়ে এইভালো, তোমাদের আদরের স্মৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে আমারমনের নিভৃত নন্দনবনের পারিজাত শাখায় যুগযুগান্তর ধরেফুটে থাক্।

[অন্য একটি পৃষ্ঠা]

তিন বছর কেটে গিয়েচে।

আমি রাণাঘাট স্টেশনে বেড়াচ্চি—প্ল্যাটফর্মে কতকগুলিবৈষ্ণব নামল মুর্শিদাবাদের ট্রেন থেকে। তার মধ্যেএকজনকে পরিচিত বলে মনে হল—তার কাছে গিয়ে তাকেচিনলাম। দ্বারবাসিনীর মালতীদের আখড়ার সেই নরহরিবৈরাগী—যে মাঝে মাঝে জীব গোস্বামীর পদ গাইত। সে-ওআমায় চিনলে। আমি একটু ইতস্তত করে জিগ্যেসকরলুম—ওখানে আর যাও-টাও ?উদ্ধবদাস কেমনআছে ?—ইয়ে—মালতী কেমন আছে ?

নরহরি একটু থেমে বল্লে—দিদিঠাক্‌রুণ মারা গিয়েচে।আজ চার বছর হল। দ্বারবাসিনীর আখড়া আর সেই আখড়ানেই বাবু। এখন অতিথ্ বোষ্টম গেলে আর জায়গা হয় না।

একথা ঠিক হিরণ্ময়ী এই তিন বছরে আমার জীবনেরঅনেক ব্যথা ভুলিয়ে দিয়েচে—কিন্তু মালতীর কথাভোলাতে পারেনি। মালতী আমার মনের যেখানে অধিষ্ঠাত্রীদেবী, গহন গভীর গোপন মুহূর্তে ধূপধুনায় তার আসন, সেই নিভৃত গোপন দেবায়তনে কারো প্রবেশাধিকার নেই।

তবুও মালতীকেও ভুলে ছিলাম একথা ঠিকই। কিন্তুআজ একথা শুনে থাকতে তো পারলুম না। দ্বারবাসিনীতেছুটে যেতে হল। স্টেশন থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতেসন্ধেবেলা মঠে গিয়ে পৌঁছুলাম। দূর থেকে মঠবাড়ির সেইতালবনটা

[পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠা]

মালতীকে ভুলেছি ?তা বলে কি ?

কতবার কত স্তিমিতদীপ নিশীথে গভীর সুষুপ্তির মধ্যেমালতী এসে যেন আমার কানের কাছে হাসি হাসি মুখেতার সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলেচে—চলেএলে যে বড় লুকিয়ে ?আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনেনেই ?

ঘুমের মধ্যেই বলি—জানি, মালতী, জানি, আমি সেভুলিনি। কোনো কাজ বাকি রাখব না। সব শেষ করে যাব।জীবনে কতবার রোগশয্যায় জ্বরে আলুথালু অচেতন তারমধ্যে দেখেচি মালতী যেন আমার বিছানার পাশে মাথারশিয়রে বসে আছে। কতবার শুনেছি সে যেন গাইচে—

মুক্ত আমার প্রাণের গোঠে।

ধেনু চরায় রাখাল কিশোর

প্রিয়জনে লয় সে হরি

ননী খায় সে ননীচোর—

চোখাচোখি হলে হাসি হাসি মুখে তার সেই ছেলেমানুষিভঙ্গিতে ঘাড় দুলিয়ে বলেচে—পালিয়ে চলে এসে বড় যেলুকিয়ে আছ ?আখড়ার কত কাজ বাকি আছে মনে নেই ?

তন্দ্রাঘোরে বলি—জানি, মালতী জানি। আমি সেভুলিনি। আটঘরার সেই হাত-ভাঙা বিষ্ণুমূর্তি আমারবাল্যের দেবতা—তাঁকেও ভুলিনি। তোমার বাবার ভাঙাবিষ্ণুমন্দিরের কথাও ভুলিনি। কোনো কাজ বাকি রাখব না।সব শেষ করে যাব।

[উল্লিখিত অংশগুলির কোনো কোনোটির সঙ্গে মুদ্রিত 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের ত্রয়োদশ পর্বের শেষ এবংউপন্যাসের একেবারে শেষ অংশের মিল খুঁজে পাবেনপাঠক।—নির্বাহী সম্পাদক।]